আধুনিক সঙ্গীতের জনক-নজরুল

এ, এফ, এম, ফতেউল বারী রাজা

প্রকাশক ঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
www.marupalash.com

প্রথম প্রকাশঃ
২৯ জানুয়ারী ২০০৭ইং
১৬ মাঘ ১৪১৩ বাঙলা।

ইন্টারনেট সংস্করণঃ
মরুপলাশ ডট কম

গ্রন্থস্বত্বঃ
লেখক

বাংলা কম্পোজ ঃ আসিফ ইসলাম
লুবনা বাসেত 'বৃষ্টি'/ জেকরা বাসেত 'নদী'

Email:
marupalash@gmail.com
www.marupalash.com

প্রকাশকের কিছু কথা

চাঁদপুরের একজন নিবেদিত লেখক গবেষক এ এফ এম ফতেউল বারী রাজা। সুদীর্ঘকাল ধরেই লিখে আসছেন। একটি মফস্বল শহরে বসে হাজারো হতাশাকে পাশ কাটিয়ে একজন লেখকের কলম এতটা শাণিত হতে পারে, তা ফতেউল বারীর লেখা না পড়লে আমি কস্মিনকালেও বোঝতে পারতাম না। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই তার লেখা নিয়ে বিশেষ করে নজরুল বিষয়ক গবেষণামুলক লেখাগুলোর অনেক আলোচনার ই-মেইল পেয়েছি। বিদগ্ধ পাঠকগন জনাব বারীর লেখা পছন্দ করেছেন। আমাদের বহুবার অনুরোধ করেছেন তার একটি নজরুল বিষয়ক বড় লেখা প্রকাশ করার জন্য। অবশেষে মরুপলাশ তার সুপ্রিয় পাঠকদের সেই তৃষ্ণা মেটাতে এবার প্রকাশ করলো ফতেউল বারী একটি মিনিগ্রন্থ **"আধুনিক সঙ্গীতের জনক-নজরুল"**। **মিনিগ্রন্থ** এজন্যই বললাম, সত্যিকার অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের পরিধি আরও ব্যাপক হয়ে থাকে। কিন্তু জনাব বারীর নজরুল বিষয়ক অতিমুল্যবান এ লেখাটি যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে একটি গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করতে পেরে মরুপলাশ তৃপ্ত। বিশেষ করে ইন্টারনেটের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আমরা বইটি এভাবে প্রকাশ করি। লেখককে পৃথিবীর বিশাল বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই ছিলো আমাদের মুল লক্ষ্য।

আপনাদের মতামত লেখককে এবং আমাদেরও সীমাহীন অনুপ্রাণিত করবে।

ফতেউল বারী রাজা

কাজী নজরুল ইসলামঃ আধুনিক সঙ্গীতের জনক

এ, এফ, এম, ফতেউল বারী রাজা

নার্গিস আসার খানমকে পেয়ে হারানোর বিরহ যন্ত্রণার বিরামহীন আঘাতে নজরুলের হৃদয় বীণাতন্ত্রীতে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাতে তাঁর অন্তর সলিলে সুর লহরীর প্লাবন ডাক দিয়ে ফুসে ওঠে মন, হৃদয় তট হয় প্লাবীত, করুণ আর্তনাদে বেজে ওঠে ব্যথার রাগিণী। তাই আত্মহারা হয়ে যান কবি একের পর এক সঙ্গীত রচনায় এই বলে,

''অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম,
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে।
সঙ্গীতে, সঙ্গীতে।''

এভাবে কাব্য লোক থেকে কবির সঙ্গীত ভুবনে হলো দীপান্তর বা নির্বাসন যা তাঁর লিখা এবং বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরাট আস্থা এবং বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

''বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল,কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাব না তাহার,
মৃৎভাË মাপিবে কি সাগরের জল?
যতদিন রবে রবি রবে সৌর লোক,
হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মি রেখা
দিব্য-জ্যোতিঃ পুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল!''

সময়টা ছিল ১৯৩৩ সাল। কবি বললেন, ''কাব্যলোকের গুলিস্তান থেকে সঙ্গীত লোকের রাগিণী দ্বীপে আমার দীপান্তর হল। সঙ্গীত লক্ষ্মী ও কাব্যলক্ষ্মী দুই বোন বলেই বুঝি এদের মধ্যে খুব রেষারেষী, একজনকে পেয়ে গেলে অন্যজন বাপের বাড়ী চলে যায়। দুজনকে খুশী রাখার ক্ষমতা কবি গুরু ছাড়া আর কে?''
১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম সম্মেলনে আরো স্পষ্ট করে বললেন, ''আমি বর্তমানের সাহিত্য সেবা থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগরদ্বীপে সেচ্ছায় নির্বাসন দË গ্রহণ করেছি।''

যে যুগে নজরুল বাংলা সঙ্গীতের রাজ্যে প্রবেশ করলেন তখন সঙ্গীত বিশেষ এক শ্রেনীর বা শিল্পী গোষ্ঠির পেশার মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। মুসলমান ভদ্রঘরে সঙ্গীত তখন পুরো ঠাঁই পায়নি।

জোড়া সাঁকো ঠাকুর পরিবার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিবার ও কিছু ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া অন্য কোন অভিজাত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সে সময় সঙ্গীত চর্চা করতো না। সত্যি কথা বলতে কি এমন পরিস্থিতির মাঝে থেকেও নজরুল সঙ্গীত ভূবনের যে ক্ষেত্রেই কলম ধরেছেন তাঁর যাদুকরী স্পর্শে কলমের আঁচড় সর্বত্রই হীরক উজ্জ্বল দিপ্তীতে উৎভাসিত হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত রাজ্যের প্রবেশের প্রথম দিকেই তিনি লক্ষ্য করলেন, তখনকার বেতার এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে তাতে 'সিমিট্রি' বা 'ইনফরমেটির' (সমতা'র) অভাব।

কোন রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্যরাগ বা রাগিণীর মিশ্রন ঘটাতে হলে সঙ্গীত শাস্ত্রে যে সুক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধ প্রয়োজন তার অভাব অধিকাংশ গানের মধ্যে দেখতে পেলেন। বাংলা গানে নজরুল যে বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি এনেছেন, তা সত্যিই বিষ্ময়াবহ, শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এক্ষেত্রে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর ভবিষ্যৎ-এ পারবে বলে মনে হয় না। তিনি যখন যে অবস্থায় থেকেছেন সেখান থেকেই সুর সংগ্রহ করেছেন। যেমন বিভিন্ন পল্লীতে থাকাকালীন সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন লোকজ সংগীতের সুর।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সন্দীপ বেড়াতে গিয়ে আনলেন সাম্পানের গান ও ভাটিয়ালী বাঁশির সুর। বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে আনলেন কীর্তনের সুর। সাঁওতাল পল্লী হতে আনলেন ঝুমুর। উর্দু গজল থেকে আনলেন গজলের সুর। এছাড়া পথচারী হিন্দুস্থানীদের কণ্ঠ থেকে, নাচের ছন্দ থেকে রাখালের বাঁশী থেকে, এবং ভিখারীদের আকুতি থেকে কবি তাঁর সুর ভান্ডার সমৃদ্ধ করলেন।

রাগ-রাগিণী একান্তভাবে করায়ত্ত করেছেন বলে তাঁর পক্ষে অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। "রাগ-রাগিণীর গভীর অনুশীলন এবং ঐকান্তিক চর্চা থেকে সুরধারা আপনা থেকেই নির্গত হয়েছে। রাগ-রাগিণী সম্পর্কে পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন এক সময় এমন এক উচ্চ গ্রাম স্পর্শ করেছে যেখানে নতুন নতুন সুরলহরী উন্মত্তের মত নজরুলের দাসত্ব করেছে। নজরুল সুরের দাসত্ব করেন নি।" রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কবির জ্ঞান যে কত গভীর ছিল তা তাঁর "স্বর ও শ্রুতি" পাঠ করলে বুঝা যায়। এ গ্রন্থে নজরুল প্রায় তিনশো রাগ-রাগিণী নিয়ে আলোচনা করেছেন। "আলোচনা কিন্তু সুরজ্ঞ সুর-রসিকের আলোচনা সুর নিয়ে তিনি যে'ন খেলা করেছেন।"

নিম্নে ''স্বর ও শ্রুতি" থেকে সামান্য উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল। এ থেকে তাঁর বিভিন্ন সুরের "স্বীকরণ" সম্পর্কেও একটি ধারণা গড়ে ওঠবে। "সুরদাসী মল্লার" এর স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেন ঃ "ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব জাতীয় রাগিণী। আরোহী ও অবরোহী দুয়েই ধৈবত গান্ধার গুপ্ত থাকে কিন্তু ঐ দুই সুর সম্পূর্ণরূপে বর্জিত নহে। মধ্যম বাদী, ষড়জ সম্বাদী। ধৈবত গান্ধার দুর্বল হওয়ার দরুণ সারং বলিয়া সন্দেহ হয়, কাজেই ধৈবতের কণ

দিয়া সারং হইতে ইহাকে বাঁচানো হয়। মধ্যম রেখাবের সঞ্জাত থাকায় খানিকটা সুরটের মত শোনায়। কিন্তু সুরটে ধৈবত পরিষ্কার রূপে বোঝা যায়- ইহাতে ধৈবত প্রায় গুপ্ত । শুধু এই কারণেই সুরট হইতে ইহার রূপ অন্যতর হয়। সুহা ও আড়াণায় গান্ধার স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয়- সুরদাস মল্লারে গান্ধার গুপ্ত। কোন কোন পন্ডিত বলেন- 'মধুমাত ও মল্লারের সংমিশ্রণে এই রাগিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।'

ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। ইহাকে 'সুর মল্লার' ও বলে।" রাগ-রাগণী সম্পর্কে সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম মার-প্যাচঁ ও বিশ্লেষণ এই উর্দ্ধৃতির মধ্যে সযত্নে ধারণ করা হইয়াছে। এই রাগিণীকে স্বীকরণ করে নজরুল অনেকগুলো গান রচনা করেছেন এবং তাদের অঙ্গে "সুর-মল্লার" বসিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিতালে নিবন্ধ সুর- মল্লারের কাঠামোয় রচিত বর্ষা ঋতুর একটি বিখ্যাত গান "রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে" এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

নজরুল প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন সুরের ক্ষেত্রে ''ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী'' ই শেষ কথা নয় বরং এদের ভাঙাচোরা যোগবিয়োগে অসংখ্য রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি হতে পারে। এই ধারণাকে পূজি করে সুর সাগরে বেশ সময় অবগাহন করে তথায় নূতন নূতন সুরের প্লাবন ঘটালেন। আবার এ ধারণাও দিলেন কেবল বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রন ঘটলেই যে মধুর রাগের সৃষ্টি হবে এমন কথা নেই। সংমিশ্রনে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটলেই সুরের মধ্যে অসুরের পদধ্বনি শোনা যাবে।" আর তখন "গান হয়ে ওঠবে এঁহ"।

এজন্যই তিনি হয়ে গেলেন সুরের রাজ্যে সুমহান অধিপতি বা সম্রাট। বাংলা সঙ্গীত জগতের ইতিহাসে নজরুল এত অধিক সংখ্যক রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করেছেন যা বাংলার অন্য কোন গীতিকার ও সুরকারের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। এমনকি এত রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অবদানেও নেই। কেবল রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করেই থেমে যাননি- তার উপর ভিত্তি করে একাধিক গান রচনা করেছেন। যেগুলো বিভিন্ন শিল্পীকে তালিম দিয়ে রেকর্ড করিয়েছেন। বাংলার আকাশ-বাতাস নূতন-নূতন সুরে মধুময় সঙ্গীতে মোহময় ও আবিষ্ট করে তুলেছেন। শ্রোতার অন্তরাত্মাকে ভরিয়ে দিয়ে তাদের তৃপ্ত করেছেন।

তেতালা থেকে বটতলা পর্যন্ত যার আবেদন এবং কদর সমানভাবেই ছিল। ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় সে সময় সাময়িকভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের গান চাপা পড়ে গিয়েছিল। নাট্য মঞ্চ, গ্রামোফোন ও বেতারে নজরুল সঙ্গীত ছিল তখন পেষ্ট্রিজ ইস্যু। আর সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' নাটিকা'র চলচিত্রায়নে রবীন্দ্র ভক্তদের বিরোধীতা উপেক্ষা করে নজরুলকে সঙ্গীত রচনা, সুর প্রদান, গাওয়া এবং পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

চল্লিশ দশকের শুরুতে নজরুল কলকাতা বেতারের সাথে যুক্ত হয়ে - প্রথমতঃ সঙ্গীতের গৌরবময় ঐহিত্যকে সমুন্নত করার মানসে, নূতনের মধ্যে পুরাতনকে জাগ্রত করার তাগিদে সুপ্ত অর্ধ-লুপ্ত বা অপ্রচলিত অনেক দক্ষিণ ভারতীয় রাগের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। পরবর্তী কালে সে প্রচেষ্টা তাঁর জীবন তপস্যায় পরিণত হয়। কঠোর পরিশ্রম এবং অক্লান্ত সাধনা বলে

এমহৎ প্রয়াসে সফল কাম হয়েছেন বলেই তিনি সংগীতের রাজাদীরাজ। উদ্দারকৃত রাগা-রাগিণী গুলির উপর ভিত্তি করে তিনি যে গান গুলি রচনা করেন তার নাম দেন হারামণি। ৮ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে কলকাতা বেতার থেকে নজরুলের হারামনি সিরিজ অনুষ্ঠান প্রচার হতে শুরু করে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষায় নূতন করে রাগ-রাগিণী'র উপর পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান পান। ব্রতী হলেন তিনি নূতন রাগ-রাগিণী উদ্ধারে। নজরুলের বক্তব্য হলো, ''রাগ-রাগিণী যদি তার 'গ্রহ'ও ন্যাস এবং বাদী বিবাদী ও সম্বাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তা হলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবেনা''।

এ ধারনা থেকে তিনি গ্রহ, ন্যাস, বাদী, সম্বাদী ইত্যাদির সামঞ্জস্যতায় বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে খেয়াল, ভাঙ্গা খেয়াল ও রাগ প্রধান গান রচনা করেন। যার ঐশ্বর্যময়ী অপরূপ সুর মুর্তি শ্রোতা ও দর্শকদের মুগ্ধকরে অবলিলা ক্রমে। এটাই তাঁর গৌরবময় কৃতিত্ব। ''নজরুলের রাগমিশ্রিত সুরের অন্তর্নিহিত শক্তি গুলোকে আশ্রয় করেই গীতরূপ গুলো বিকাশলাভ করেছে। আর বাণী গুলো সুরের তরঙ্গালীলায় উদ্ভাসিত হয়ে সৃষ্টি করেছে নূতন নূতন সুর''। এভাবে সুরের বিশুদ্ধিও শাস্ত্রের অনুশাসনে একে বারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ধ্রুপদ থেকে বেড়িয়ে আসলেন। ''হিন্দী ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল ধ্রুপদ হতে পারেনা।''

এ ধারণা পাল্টে দিলেন। অভিমত ব্যক্ত করলেন, ''এ তিনটি ধারার উৎস এক জায়গা হতে, শুধু বৈশিষ্ট্য আলাদা, বাংলা খেয়াল হল হিন্দী খেয়ালের সুরের প্রতিবিম্ব, শুধু বাণী অংশ হিন্দীর বদলে বাংলা আবার হিন্দী খেয়ালকে ভেঙ্গেই ভাঙ্গা খেয়ালের জন্ম''। এভাবে বাংলা গানকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সহজ সুন্দর মিলন ঘটিয়ে বাউল-কীর্তন-ভাটিয়ালির গতানুগতিকতা বা এক ঘেয়েমী থেকে উদ্ধার করে হলেন ওস্তাদের ওস্তাদ। ''হিন্দুস্থানী গানের মতো নজরুলের রাগভিত্তিক গান গুলোতে কথা সুরের দাস হয়ে রইলনা বরং কথা ও সুরের সুমধুর সখ্য স্থাপিত হল।' ''বিশুদ্ধ রাগিণীতে রচিত নজরুলের খেয়াল গানের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে কিছু খেয়াল বিখ্যাত হিন্দুস্তানী খেয়ালের কাঠামো বা Structure এর ওপরে বাংলায় কথা বসানো। যার বাণী খুবই সংক্ষিপ্ত-অস্থায়ী ও অন্তরাতে সীমাবদ্ধ। খেয়াল গুলোতে কথা ছোট কিন্তু বাণী কাব্যমূল্য সমৃদ্ধ''। যেমন-

১। দরবারী-
'আজি নিঝুম রাতে'
২। আনন্দ-
'দুর বেণু কুঞ্জে'

৩। মেঘ-
'গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী'

৪। নট বেহাগ –
'রুম ঝুম ঝুম বাদল নূপুর বোলে বোলে'।

৫। দেশ–খাম্বাজ
'পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া'।
৬। কাফি–খাম্বাজ
'চঞ্চলা মেঘ–কুন্তলা মেয়ে কে তুমি' ?

৭। খাম্বাজ–বাহার –
'বাজে জলদ–মৃদঙ্গ বাজে।'
৮। নটমল্লার–
'ফিরে নাহি এলে প্রিয়'
ফিরে এল বরষা !

৯। মেঘ মল্লার–
'বরষা ঐ এল বরষা'।
১০। গৌর মল্লার–
'মেঘের ডমরু ঘন বাজে'।

১১। সুরট–মল্লার–
'মল্লারের সুরধারা ঝরে বারিধারে'।
১২। মিয়া মল্লার–
'অবিরত বদর বরষিছে ঝর ঝর।
বাহিছে তরলতর পুবালী পবন'।।

১৩। রামদাসী মল্লার–
'ঝর ঝর ঝরে শাওন–ধারা।
ভবনে এলে মোর কে পথহারা' !
১৪। কাফি–কানাড়া–
'আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে'।

১৫। কাজরী–
'রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাজে কাজরী'।

১৬। জয়জয়ন্তী/ ত্রিতাল –
'মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ
'আমারি মত কাঁদে দিশাহারা,'

১৭। জয়জয়ন্তী/ত্রিতাল-
'মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা
তুমি ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি'।
১৮। মালকোষ-
'শোন লো বাঁশীতে ডাকে আমারে শ্যাম'।

১৯। ইমন-
'এই মন সন্ধ্যাকালে
সুরের প্রবাহ ঢালে'।
২০। পুরবী-
'অস্তাচলে গেল রবি,
নামিল বিধুর পুরবী'।

২১। ভৈরবী-
'স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী
মৃদুভাষিণী মধু হাসিনী'।।
২২। খাম্বাজ-
'কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
নব মুকুলিত আমের শাখে'।।

২৩। শঙ্করা-
'মধুর নূপুর রুমুঝুমু বাজে।
কে এলে মনোহর নটবর সাজে'।।
২৪। বৃন্দাবনী সারং-
'তৃষিত আকাশ কাঁপে রে,
প্রখর রবির তাপেরে'।

২৫। আনন্দী-
'বলেছিলে ভুলিবেনা মোরে।
ভুলে গেলে হায় ! কেমন ক'রে'।।
২৬। টোড়ী-
'নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়।
তাহার ধ্যানের চাঁদ ডুবে যায়'।।

২৭। বসন্ত-পঞ্চম-
বসন্ত এল এল এলরে (ওই)।
পঞ্চম স্বরে   কোকিল কুহরে

মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।।

২৮। আশা-ভৈরবী-
'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ-
আছে শুধু প্রাণ-
অনন্ত-আনন্দ হাসি অফুরাণ'।।
২৯। ললিত-
'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে।
কৃষ্ণচূড়ার বনে ফাগুন সমীরণে
ঝরে ফুল বন-পথ তলে'।

৩০। ভেঁরো-
'জয় বিগলিত-করুণা রূপিণী গঙ্গো।
জয় কলুষ হারিণী পতিত-পাবনী
নিত্য পবিত্রা যোগী-ঋষী-সঙ্গো'।।

নজরুল ভাঙ্গা খেয়াল নামে আরো একধরনের রাগ প্রধান গান রচনা করেন, যার বাণী বাংলা গানের নিয়মে অস্থায়ী, অন্তরা, অভোগ, সঞ্চারী নিয়ে পরিপূর্ণ এবং এর বৈশিষ্ট্য উচ্চাঙ্গা রাগ সঙ্গীতের সমকক্ষ। ভাঙ্গা খেয়ালের বাণী সংক্ষিপ্ত নয়। যেমন-

(১) সাবন্তসারং/ত্রিতাল -
'মেঘ বিহীন খর বৈশাখ'
(২) নীলাম্বরী/ ত্রিতাল -
'নীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায় কে যায়'

(৩) ছায়ানট-জলদ /একতাল-
'শূণ্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়
(৪) হিজাজ ভৈরবী/ ত্রিতাল
'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি'

(৫) খাম্বজ/ ত্রিতাল -
'কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া'-

(৬) দরবারী কনাড়া -
'বাজে মিদঙ্গা বাজে'

(৭) আহির ভৈরব/ ত্রিতাল -
'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী'
রাগভেঙ্গো ও রাগ মিশ্রনে নতুন সুর সৃষ্টি নজরুলের এক মহৎ প্রয়াস বা অভুতপূর্ব কৃতিত্ব। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করতেই হয়।

১। জয়জয়ন্তী খাম্বাজ-
'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়
তবু যেতে হবে হায়'।।
২। নট মল্লার ছায়ানট-
'হাজার তারার হার হয়েগো
দুলি আকাশ বীণার গলে'।

৩। ভৈরবী, আশাবরী ভূপালী-
'রংমহলের রংমশালি মোরা
আমরা রূপের দীপালি'।
৪। বেহাগ, তিলক, কামোদ, খাম্বাজ-
'কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায়
কারে কহি' ?

৫। কালাংড়া, বসন্ত, হিন্দোল-
'আজি দোল পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা
আয়'।
নজরুল নুতন সৃষ্টির তাগিদে প্রচলিত ও নুতন উভয় রাগ মিশ্রণ করেছেন। আর এ জন্য প্রয়োজনে ওস্তাদের কৌলিন্য ও বিধি নিষেধ অমান্য করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে,

১। তিলক, কামোদ, দেশ দিয়ে-
''এক ডালি ফুল ওরে সাজাবো কেমন করে''
২। সিন্ধু কাফি, খাম্বাজ দিয়ে-
''আজি এ কুসুম হার সহি কেমনে''।

কেবল নুতন রাগ সৃষ্টিতে কবির সব প্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকেনি। যখন সুর তবলার সঙ্গাতে ঠিকমত সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়না, তখন সুরের খাতিরে তিনি তবলায় নতুন তালের সৃষ্টি করেছেন। যেমন- **১৯** মাত্রার নবনন্দন তাল।

নবনন্দন তাল-
দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে,
কাঁপে অধর আঁখি অরুণ রাগে॥

নজরুল ব্যাপক ভাবে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে বাংলা গানের প্রভূত সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য রাগরাগিণী থেকে কিছু উল্লেখ করছি। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন। সঙ্গীত ভুবনে নজরুলের অবস্থানের বিশালতা, মিশ্র সুর, মিশ্র দেশ, দেশ-খাম্বাজ, মিশ্র খাম্বাজ, মিশ্র দেশ-খাম্বাজ, মিশ্র কাফি-খাম্বাজ, মিশ্র ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, মিশ্র বাগেশ্রী-খাম্বাজ, মিশ্র ভৈরবী-খাম্বাজ,লুম- খাম্বাজ, ইমন-খাম্বাজ, মিশ্র ইমন-খাম্বাজ, কাফি-খাম্বাজ, মিশ্র-খাম্বাজ-কাফি, সিন্ধু-খাম্বাজ, সুরট-খাম্বাজ, পিলু-খাম্বাজ, বেহাগ-খাম্বাজ, মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ, খাম্বাজ-বাহার, মিশ্র আড়ানা, ভীমপলশ্রী, মিশ্র ভীমপলশ্রী, ভৈরবী পিলু, দেশ পিলু, খাম্বাজ পিলু, তিলক কামোদ পিলু, দুর্গা-খাম্বাজ পিলু, পিলু-ঠুংরী,

পিলু- বারোয়া, মিশ্র পিলু বারোয়া, ইমন-বেলাগুন, ইমন-মালবশ্রী, ইমন-ভূপালি, মিশ্র পুরবী, গৌরী-পুরবী, মিশ্র ইমন-পুরবী, চাঁদনী-কেদারা, বৃহন্ন-কেদারা, মল্লার, মিশ্র মল্লার, ধুরিয়া-মল্লার, রামদাসী-মল্লার, সুরট-মল্লার, মিয়াঁ-মল্লার, গৌরমল্লার, মেঘমল্লার, নট-মল্লার, নটমল্লার- ছায়ানট, নট- বেহাগ, কালাংড়া-বেহাগ, তিলক কামোদ দেশ, মিশ্র-তিলক কামোদ, সাহানা জয়জয়ন্তী, মিশ্র কানাড়া, দরবারী-সুখড়াই কানাড়া, কাফি-কানাড়া, কাফি-কার্ফা, আশা-কার্ফা, বাগেশ্রী-কাফি, রঁসিয়া কাশোরী,

হিন্দোল-শ্রীপঞ্চমী, মিশ্র-আশাবরী, জোনপুরী-আশাবরী, দুর্গামান্দ, টোরী-মান্দ, মিশ্র দুর্গা, বেনাগুল ঠাটের দুর্গা, মাল কোষ- ভৈরবী -মেঘ-বসন্ত, পরজ বসন্ত, বসন্ত- বাহার, বসন্ত-মুখারী, শ্যাম-কল্যাণ, শাওন-কল্যাণ, ইমন-কল্যাণ, হেমকল্যাণ, যোগিয়া মিশ্র, পিলু মিশ্র, ভূপালি মিশ্র, বেহাগ মিশ্র, জৌনপুরী মিশ্র, সিন্ধু মিশ্র,বিভাগ মিশ্র, আনন্দ-ভৈরব,আহির-ভৈরব,বিষ্ণু ভৈরব, রুদ্র-ভৈরব, শিবানী ভৈরব, শিবমত ভৈরব, উদাসী ভৈরব, মিশ্র শিবরঞ্জনী, ভৈরবী-শিবরঞ্জনী, ভৈরবী ঠুংরী, মিশ্র ভৈরবী, পিলু-ভৈরবী, আশা-ভৈরবী, মিশ্র আশা-ভৈরবী, কাফি- সিন্ধু, মিশ্র কাফি-সিন্ধু, পাহাড়ী, মিশ্র পাহাড়ী, পাহাড়ী-কানাড়া, কাফি-কানাড়া, দরবারী-কানাড়া, মিশ্র কানাড়া, মিশ্র বিলাবল,

আলাহিয়া-বিলাবল,পুরিয়া-ধানেশ্রী, কাজরী-ঝুমুর, দেবগান্ধার, জয়জয়ন্তী, মিশ্র সিন্ধুড়া, মিশ্র যোগিয়া, মিশ্র গারা, মিশ্র ঝিঁঝিট, মিশ্র সারঙ্,লঙ্কাদহন সারঙ্, বড় হংস সারঙ্, রক্ত হংস সারঙ্, মিশ্র গৌড়-সারঙ্,মধুমাধবী-সারঙ্,মিশ্র গান্ধারী,মিশ্র ছায়ানট, মিশ্র মালবিকা, মিশ্র নারায়ণী, মিশ্র কামোদ, কাফি-কার্ফা, মিশ্রতিলককামোদ, মিশ্রতিলং, নট,নারায়ণ, শাঙ্কান, মালগুঞ্জ, ভৈঁরো, জংলা, মিশ্র আড়ানা, আড়ানা-বাহার (চতুরঙ্গা) ইত্যাদি।

উপরি উল্লেখিত মিশ্র রাগ-রাগিণী গুলির উদাহরণ দিতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বিধায় আমি কেবল মাত্র প্রথম এবং শেষটির উদাহরণ দেব। "উতল হ'ল শান্ত আকাশ তোমার কলগীতে।"

উক্ত সঙ্গীতে নজরুল আমাদের মুখ দিয়ে সে সময়ের সত্য ভাষণ টি প্রকাশ করেছেন। তখন গ্রামফোন রেকর্ড এবং কলকাতা বেতারে নজরুল সঙ্গীত যে ভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তাতে সংগীতের মূর্ছনায় শান্ত আকাশ উতল হয়ে উঠেছিল। আর শেষ গানটি লক্ষ্য করুন, এটি আড়ানা-বাহার (চতুরঙ্গা) ত্রিতাল এর উপর একটি হাসির গান। যা সঙ্গীত-স্রষ্টা নজরুলের বিস্ময় কর প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শণ।

"রাম-ছাগী গায় চতুরঙ্গা বেড়ার ধারে।
গাইয়ে ষাঁড়, সাথে বাছুর, হাম্বা রবে
ভীষণ নাদ ছাড়ে।
ফেটে গেল বুঝি কান, প্রাণে মারে!
শুনিয়া হাই তোলে 'ভেউ, ভেউ' রোলে—
ভুলোটা পগার-পারে।

তেলেনা—ডিম নে রে, তা দেরে, আমি না রে, তুই দে রে,
নে রে ডিম দে রে, তা, তা দে না—
ওদের ? না না ! তাদের ? না না ! তুই দেরে ডিম।
ওদের নারী তাদের নারী দেদার নারী, দেরে নারী—
যা, ধেৎ! টানাটানি।
সার্গম্—ধা পা রে ধা রে গা গা রে গা ধা গা রে গা
নি ধা মা মা পা রে নি মা রে গা, সা রে নি ধা !
তবলার বোল — ভেগে যা, মেগে খা,
মেরে কেটে খা মেরে কেটে খা—
তেড়ে ধ'রে কাট্ দুম্ ;
ধ'রে কেটে রাখুন না রাখুন না।
নাক ধ'রে টান কান ধ'রে টান
শুধু কাটা থাক দুম্।"

উচ্চাঙ্গা সংগীতের খেয়াল, ঠুংরীর প্রভৃতির ন্যায় 'চতুরঙ্গা' একশ্রেণীর গান। এই প্রকার গানে স্থায়ী অংশ অর্থাৎ উপরের অংশ খেয়ালের ন্যায় কাব্যিক। স্থায়ীর পর তারাণা (তেলেনা),সার্গম্ ও তবলার বোল দ্বারা বাকী তিনটি অংশ গ্রথিত হয়। এই গানে চার প্রকার অঙ্গাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম করণ 'চতুরঙ্গা' হইয়াছে।

ইহা সঙ্গীতের যেন মহীরুহ। উপরের অংশ ফল-ফুল, তার পরের অংশ পাতা-ডাল, এর পর কান্ড এবং সবশেষে মূল। একে হিলাবেকে?

নজরুল কত বিচিত্র লয়, তাল এবং সুরের সমাবেশ ঘটিয়ে সঙ্গীতের বাণীর সাথে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করার মত। আর সঙ্গীতে এই বিচিত্র সুরের সমন্বয় কোথাও শ্রোতার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে আঘাত করেনি বরং সঙ্গীতগুলির শ্রবণ সুখকর হয়ে উঠেছে। ''সুর সম্পর্কে যাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তারা বুঝবেন সুরের সম্রাজ্যে নজরুল প্রজা বা

জমীদার বা নবাব নন- একেবারে ময়ূর- সিংহাসনের অধিকারী- সুমহান সম্রাট। সঙ্গীত সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই, এর কোন দ্বিতীয় নেই, সত্যই নজরুল একক, নজরুল অনন্য।''

এ যাবত কবি সৃষ্ঠ সতের রাগের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো হলো--দেবযানী, দোলন চাঁপা, বেণুকা, বনকুন্তলা, মীণাক্ষি, সন্ধ্যামালতী, রূপমঞ্জরী, শিব-সরস্বতী, অরুণ-রঞ্জনী, উদাসী ভৈরব, রুদ্র ভৈরব, অরুণ ভৈরব, যোগিণী ভৈরব, আশা ভৈরবী, শিবানী ভৈরবী, শঙ্করী ও নির্ঝরিণী। নজরুল অসামান্য প্রতিভা গুনে তিনি প্রথমে সুর ঠিক করছেন পরে সুরের কাঠামো অনুযায়ী বাণী বসিয়ে রাগের নাম গানের প্রথম লাইনে ব্যবহার করেছেন। আগে বীণা ঝংকৃত হয়ে ওঠে পরে বাণী ফোটে। নজরুল সঙ্গীতের সুর সুন্দর্যের ঐশ্বর্য এখানেই।

নিম্নে সংগীত গুলোর বাণীর মধ্যে অনুপম সুন্দরভাবে অত্যন্ত সুনিপুন কৌশলে রাগের নাম ব্যবহার করে নজরুল যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত।

১। দেবযানী - নবনন্দন তাল

'দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলিজাগে।
কাঁপে অধর-আঁখি অরুণ অনুরাগে॥

২। দোলন-চাঁপা-ত্রিতাল

'দোলন-চাঁপা দোলে - দোল - পূর্ণিমা-রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যামা পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা লতার দোলনাতে' ॥

৩। বেণুকা- ত্রিতাল

'বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে' ॥

৪। বনকুন্তলা -ত্রিতাল

'বনকুন্তল এলায়ে
বন-শব্বী ঝুরে
সকরুণ সুরে।
বিষাদিত ছায়া তার
চৈতালী সন্ধ্যার
চাঁদের মুকুরে' ॥

৫। মীণাক্ষি-ত্রিতাল

'চপল আঁখির ভাষায়, হেমীণাক্ষি-
ক'য়ে যাও-
না বলা কোন বাণী বলিতে চাও' ॥

৬। সন্ধ্যা-মালতী-সেতারখানি

'শোন ও সন্ধ্যা-মালতি
বালিকা তপতী-
বেলা শেষের বাঁশী বাজে।
মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ-মাঝে'।।

৭। রূপমঞ্জরী -ত্রিতাল
'পায়েলা বোলে রিণিঝিণি
নাচে রূপ-মঞ্জুরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী।
ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে,
ছড়ায়ে তারার ফুল নাচে যেন নিশিথিনী'!

৮। শিব-সরস্বতী-ত্রিতাল
'জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী।
জয় ধ্রুব জ্যোতিঃ জয় বেদবতী' ॥

৯। অরুণ-রঞ্জনী-ত্রিতাল
'হাসে আকাশে শুকতারা হাসে,
অরুণ-রঞ্জনী উষার পাশে' ॥

১০। উদাসী ভৈরব-ত্রিতাল
'সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে-
বিষাণ ত্রিশূল ফেলি' গভীর বিষাদে'।

১১। রুদ্র-ভৈরব-সুর ফাঁক্‌তাল
'এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি, হে প্রলয়ঙ্কর।
রুদ্রভৈরব সৃষ্টি' সংহর সংহর' ॥

১২। অরুণ -ভৈরব- সাদ্রা
'জাগো অরুণ-ভৈরব।
জাগো হে শিব-ধ্যানী।
শোনাও তিমির-ভীত বিশ্বে
নব দিনের বাণী'।

১৩। আশা ভৈরবী-ত্রিতাল
'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ-
আছে শুধু প্রাণ
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরাণ' ॥

১৪। শিবানী -ভৈরবী/ত্রিতাল

'ভগবান শিব জাগো জাগো,
ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।
শক্তি-হীন আজি সৃষ্টি
চন্দ্র-সূর্য-তারা হীন-জ্যোতি'।

১৫। শঙ্করী-একতালা (চতুর্মাত্রিক)
'শঙ্কর অঙ্গালীনা যোগমায়া
শঙ্করী শিবানী।
বালিকা-সম লীলাময়ী।
নীল উৎপল-পানি' ॥

১৬। নির্ঝরিণী - ত্রিতাল
'রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ কে বাজায়
জল ঝুম্ ঝুমি।
রুম্ ঝুম্ কে বাজায়
চমকিয়া জাগে-
ঘুমন্ত বনভূমি' ॥

১৭। নট নারায়ণ -তেওড়া
'নাচে রে মোর কালো মেয়ে নৃত্যকালী শ্যামা নাচে।
নাচ হেরে তার নটরাজও পড়ে আছে পায়ের কাছে' ॥

১৮। কৌশিক-তেওড়া
'মায়ের আমার রূপ দেখে যা মা যে আমার কেবল জ্যোতি।
(মার) কৌশিকী রূপ দেখ্‌রে চেয়ে মা, শুদ্ধামহা সরস্বতী' ॥

১৯। শিবরঞ্জনী
'জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী।
শিব-জটা হ'তে সুরধুনী স্রোতে
বারি' শতধারে ভাসাও অবনী' ॥

২০। বৃন্দাবনী সারং- কাওয়ালী
'বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরী বাজে।
গোপিনী উন্মনা, মন নাহি কাজে' ॥

২১। শতাক্ষী
'নীলোৎপল-নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী।
শত চোখ শত নীলপদ্ম ফুটিয়াছে মরি,মরি' ॥

২২। শ্যামকল্যাণ-ত্রিতাল
'রস-ঘনশ্যাম- কল্যাণ-সুন্দর।
প্রশান্ত সন্ধ্যার উদার শান্তি দাও,

শ্রান্ত মনের ভার হর, হে গিরিধর' ॥

২৩। দরবারী টোড়ী-তিল্ওয়ারা

'উদার অম্বর দরবারে তোরই প্রশান্ত প্রভাব বাজায় বীণা,
শতদল- শুভ্রা পদতল-লীনা, প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা' ॥

২৪। বিষ্ণু ভৈরব -ত্রিতাল

'বিষ্ণুসহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন শম্ভু মাধব'।

২৫ নারায়ণী -ত্রিতাল

'নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
হিমগিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা বেশে' ॥

২৬। সিন্ধু -ত্রিতাল

'বেদনার সিন্ধু-মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী।
জাগো, জাগো করে সুধা-পাত্রখানি' ॥

২৭। মালগুঞ্জ-ত্রিতালী

'গুঞ্জ-মালা গলে কুঞ্জে এস হে কালা।
বনমালী এস দুলাইয়া বন-মালা' ॥

২৮। রক্ত হংস-সারং-আদ্ধা

'বল রাঙা হংসদূতী তা'র বারতা।
দাও তা'র বিরহ-লিপি, বল সে কোথা' ॥

২৯। নব ভবন-মাঙ্গালিকী

'ভুবনের নাথ! এনব ভবনে তব আশীষ
ঝরুক শ্রাবণ-বারিধারা সম অহর্নিশ' ॥

৩০। হিন্দোল-গীতঙ্গী

'দুলে চরাচর হিন্দোল - দোলে,
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি কোলে' ॥

৩১। কাজরী - কাহারবা

'রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম বাজে কাজরী।
ঝুলন দোলায় দোলে নীলাম্বরী'।

৩২। মেঘ রাগ-ত্রিতালী (দ্রুতগতি)

'ঘোরিয়া গগন মেঘ আসে,
বিহবল ধরনী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে' ॥

৩৩। রাগেশ্রী (খাম্বাজ ঠাট)/ ত্রিতাল
'কার অনুরাগে শ্রীমুখ উজ্জল।
কার সঙ্গে মধুনিশি যাপিলে চঞ্চল' ?

এতদ সত্বেও কবি বহু বিদেশী সঙ্গীত থেকে সুর সংগ্রহ করে বাংলা গানে অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে সন্নিবেশ করে তাকে করেছেন সমৃদ্ধ। যেমন-

১। কিউব্যান সুরে (নৃত্য সম্বলিত)ঃ
'দুর-দ্বীপ- বাসিনী-!
চিনি তোমারে চিনি,-
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো
সুমন্দ-ভাষিনী' ॥

২। ইজিপ্সিয়ান্ সুরে (নৃত্য সম্বলিত)ঃ
'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়,
বিহবল চঞ্চল পায়' ॥

৩। আরবী নৃত্যের সুরে (কার্ফা) ঃ
'চম্ কে চম্‌কে, ধীরু ভীরু পায়
পল্লী-বালিকা বন পথে যায়
একেলা বন পথে যায়'।

৪। আরবী নৃত্যের সুরে (কাহার্‌বা)ঃ
'শুক্‌নো পাতার নুপুর পায়ে
নাচিছে ঘুর্ণীবায়'।

৫। আরবী নৃত্যের সুরে (বিচিত্রা/কাহার্‌বা)ঃ
'রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নুপুর বাজায়ে কে যায়' ?

৬। আরবী নৃত্যের সুরে (মিশ্রসুর কাহারবা)ঃ
'ওগো প্রিয়, তব গান আকাশ গাঙের জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়'।

৭। আরবী নৃত্যের সুরে (দ্বৈত সংগীত)ঃ
'পুঃ জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি,মিষ্টি, মিষ্টি' ॥

৮। মধ্য প্রাচ্যও বাংলা সঙ্গীতের অপূর্ব মিশ্রনে (ঝুমুর)ঃ
'মেঘ্‌লা নিশি ভোরে, মন যে কেমন করে,
তা'রি তরে গো মেঘবরণ যা'র কেশ'।

৯। মধ্যপ্রাচ্য সুরের সঙ্গো বাংলা
'লোক সংগীতের অপূর্ব মিশ্রণে - (ভাটিয়ালী/ দাদরা)ঃ
পদ্মার ঢেউ রে!
মোর, শূন্য হৃদয় -পদ্ম নিয়ে যা, যা রে'।

১০। মধ্য প্রাচ্য সুরের সঙ্গো বাংলা
'লোক সংগীতের অপূর্ব মিশ্রণে (ঝুমুর)ঃ
'চোখ গেল চোখ গেল' কেন ডাকিস-রে-
চোখ গেল পাখী'।

১১। মধ্যপ্রাচ্য সুরের সঙ্গো বাংলা
'লোক সংগীতের অপূর্ব মিশ্রনেঃ
পুরব দেশের পুর নারী'।

১২। পাশ্চাত্য সুরে চতুর্মাত্রিক (কাহারবা)ঃ
'যাই গো চ'লে যাই।
না -দেখা লোকে জানিতে চির- অজানায়'।

১৩। দক্ষিণ ভারতীয় সুরে (কর্ণাটকি সামন্ত/ত্রিতাল)ঃ
'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা
আনমনে ভাসাও চম্পা, শেফালিকা' ॥

১৪। তুরস্কের লোক সঙ্গীতের সুরে (ইসলামী সঙ্গীত)ঃ
'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়,
আয়রে সাগার, আকাশ, বাতাস, দেখবি যদি আয়' ॥

১৫। মৌরচিকা সুরে (গজল/কাহার্বা)
'বুলবুলি নীরব নার্গিস - বনে।
ঝরা - বন- গোলাপের বিলাপ শোনে' ॥

১৯৪০ সারের ১৩ জানুয়ারী কলকাতা বেতারে ৭টা ২০মিনিটে সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু করলেন নুতন রাগ প্রচারের অনুষ্ঠান 'নবরাগ মালিকা'।

কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় ''নজরুল মাত্র তিনটি অনুষ্ঠান প্রচার করার পর অসুস্থ হয়ে পরেন এবং এই নামে আর কোন অনুষ্ঠান প্রচার হয়নি। 'নবরাগ মালিকা'র প্রথম অনুষ্ঠানের পূর্ণকপি কলকাতা বেতারের মুখপত্র 'বেতার জগত'- এ ছাপা হয়েছিল। এ জন্য মূল অনুষ্ঠানের কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের গানগুলোও গান গুলোর রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাওয়া সম্ভব হলে ও অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হতো তারা আর কেউই জীবিত নেই। তৃতীয় অনুষ্ঠানে কি কি গান কোন কোন রাগ- রাগিণীতে প্রচারিত হয়েছিলো তা জানা সম্ভব হয়নি।''

নব রাগ মালিকার প্রথম আনুষ্ঠান জানা যায়। এই অনুষ্ঠানটি রচনা, সুরারোপ এবং প্রযোজনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। এর প্রতিটি গানই নজরুল কর্তৃক রচিত এবং সুরারোপিত। ধারা বর্ণনায় ছিলেন অনিল দাস এবং ব্যাঞ্চনায় ছিলেন গিতা মিত্র এবং শৈল দেবী। অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা হয়েছিল কবিতার ছন্দে। এই অসাধারণ কাজটিও করেছিলেন নজরুল।

এই গীতি নাট্যটি কলকাতা বেতারের মুখপত্র 'বেতার জগত'- এর ১৬-০১-১৯৪০ তারিখের সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় এ সংখ্যায় 'আমাদের কথা' বিভাগে এই অনুষ্ঠানের বিষয় বলতে গিয়ে বলা হয়েছে,''আমাদের কথাঃ' নবরাগমালিকা'- ১৩ই জানুয়ারী শনিবারের সায়াহ্নে এই অনুষ্ঠানটি হয়ে গেছে।। কবি নজরুল ইসলামের অনন্য সাধারণ প্রতিভার দান এই 'নবরাগ মালিকা' কবি নজরুল ইসলাম অনেক গুলি নূতন রাগিণী নিজে রচনা করেছেন। সেগুলির ভিতর থেকে ছ'টি রাগিণী চয়ন করে নিয়ে এই মালিকা গাঁথা হয়েছে।

তাঁর এই নূতন রাগিণী গুলি ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আমরা আশাকরি আমাদের দেশের সঙ্গীত বেওারা এই নূতন রাগিণী গুলিকে গ্রহণ করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে কুণ্ঠিত হবেন না''। রাগিণী ছয়টি হলো নির্ঝারিনী, বেণুকা, মীনাক্ষি, সন্ধ্যামালতী বনকুন্তলা এবং দোলনা চাঁপা, জন সাধারনের জ্ঞাতার্থে বেতার জগত এর ঐ সংখ্যায় 'নবরাগ মালিকা গুলো প্রকাশ করা হয়েছিল। নজরুল বলেছেন '' ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গা সঙ্গীত যে অভিনব রস সৃষ্টি করতে পারে, মানুষের মনকে মহত ও মহীয়ান করতে পারে তা আধুনিক সুরের এক ঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারেনা।

আর যারা মনে করেন হিন্দী ছাড়া বাংলাভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ, ইত্যাদি গান হতে পারেনা, আমার এই গান দুইটির স্বর সমাবেশ ও তালের লয়ের ও ছন্দের কর্তব্য তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের আঙ্গিক বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখেও এই গান দুইটি তা প্রমাণ করবে।'' এই গীতি নাট্যের দুটি গান (১) 'বেণুকা কে বাজায় মহুয়া বনে' এবং (২) 'দোলন চাঁপা বনে দোলে' শিল্পী গীতা মিত্র (বসু) সেনোলা রেকর্ডে গেয়েছেন। রেকর্ড নং কিউ এস ৪৬৫ প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৪০ সাল।

'গান শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী' শিল্পী রাধারাণীর কণ্ঠে কলোম্বিয়া রেকর্ডে গীত হয়েছে। রেকর্ড নং জি,ই-২৫৫১ প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সাল। এই গানটি শিল্পী ধীরেন মিত্র এইচ এমভি রেকর্ডে গেয়েছেন, রেকর্ড নং এন- ২৭৩৭৮ প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল। দুটি রেকর্ডই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এ থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, উনবিংশ শতকে যাবতীয় সদগুন লালন ও বিকশিত করে সঙ্গীত রচনায় মহানায়ক ছিলেন নজরুল। আবার বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনের ডাকের তাগিদে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টির নবচেতনার শক্তিধর মুখপত্র হয়ে ঘুরে দাড়ালেন তিনি এবং সঙ্গীত বাংলায় নব উদ্যোগে পরিবেশেনের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থান করলেন। বাণী রচনায় সুর সংযোজনায় ও গায়েনে

তখন চকৎকার ফল পাওয়া গেছে। সে সময় নজরুল ছিলেন বাংলা সঙ্গীতের পুরোনো ধারা এবং নব উদ্যেগের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ।

পুরোনো ধারাটি হচ্ছে, যিনি সঙ্গীতকার, তিনিই সুরকার ও গায়ক। নব উদ্যোগে থাকছে শ্রম বিভাজন। এখানে থাকছেন সঙ্গীতকার, সুরকার ও গায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এরেঞ্জার যন্ত্রানষঙ্গ নির্মাতা। এভাবে সবে মিলে হয় একটি সঙ্গীত দ্রব্য। স্বয়ং সঙ্গীতকার, সুরকারও গায়ক হওয়া সত্বেও তিনি অপরাপর সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীকে তাঁর সঙ্গীতের জন্য প্রশস্ত জায়গা করে দিলেন।

আর সে জন্যই রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিল্পী কানন দেবী প্রায়ই হিজমাষ্টার ভয়েজের রিয়ার সাল রুমে নজরুলের কাছে সঙ্গীত চর্চা বাদ দিয়ে ছুটে আসতেন একটা ভাল গান লুফে নেওয়ার জন্য। কানন দেবী মুলতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিল্পী হলেও বিখ্যাত হয়েছেন নজরুল সঙ্গীত দিয়ে। এমন একটি তার গাওয়া গান ''ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বন ফুল গো''। একুশ শতকের ভাবনা অন্য রকম। যুক্ত হলো চিত্রায়ন। গান শুধু বসে বা দাড়িয়ে গাইলে চলবেনা। পর্দায় এর একটা চিত্র ভাষ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।

শিল্পী গান গাইবেন পর্দায় দেখা যাবে তার চিত্র ভাষ্য। এক্ষেত্রেও নজরুল সঙ্গীতের সম্ভাবনা আকাশের নক্ষত্র রাজির ন্যায় হীরক উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু এর জন্য চাই সঙ্গীত নির্বাচনে দক্ষতা এবং তার বিপরীতে চিত্র ভাষ্য নির্মাণে কল্পনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ। ইতঃ মধ্যে আমাদের দেশে চিত্রভাষ্যসহ নজরুল সঙ্গীতের একাধিক সম্প্রচার ঘটেছে। অবশ্য এটি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ''একে পাকাপোক্ত করতে সময় লাগবে এবং অভিনিবেশের সঙ্গে যদি এই মাত্রাটিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে ভালফল পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

রাগ প্রধান গান হলো রাগাশ্রয়ী কাব্যগীতি, কাব্যে আবেগজড়িত আধুনিকতার ছোঁয়া এবং তাকে রাগের অবয়বে সুরে আবদ্ধ করাই রাগ প্রধান গান। সুরের বিশুদ্ধি ও শাস্ত্রের অনুশাসনে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। একই পথে হাঁটতে হয়। পদাঙ্খলন হলেই সর্বনাশ, পরিমিত বোধ নির্দিষ্ট, কোথাও ব্যতিক্রম নেই। সে যুগে দক্ষিণ ভারতিয় সঙ্গীত হিন্দু ঘরানায় এবং উত্তর ভারতিয় সঙ্গীত মুসলিম ঘরানায় আখ্যায়িত হতো।

নজরুল দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের খেয়াল থেকে সৃষ্টি করলেন ঠুংরী, ভাঙ্গা খেয়াল, গীত, নাত, কাওয়ালী, টপ্পা, গজল, কাজরী ইত্যাদি। অতুল প্রসাদ বাংলা গানে ঠুংরী প্রচলন করেন, নজরুল তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ধ্রুপদে আছে ওস্তাদী কসরৎ। কিন্তু খেয়ালে সুরের মাদকতা। শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ভাতখÉজী বলেছেন, "মুসলিম ওস্তাদরা হিন্দু সঙ্গীতবিদদের মত শ্রাস্ত্র পারঙ্গাম না হতে পারেন তবে সুর সৃষ্টির মৌলিকতা, সঙ্গীতের রসোচ্ছলতা মুসলিমদের বেশী। সুরের নিত্য নতুন লীলা, সম্মোহন, মাদকতা ও প্রাণ মাতানো গুঞ্জরন, খেয়াল-ঠুংরীকে আরো ঐতিহ্যমন্ডিত ও ঐশ্বর্যময়ী করেছে।" নজরুল খেয়াল গানের বিস্তারকে যেভাবে তাঁর সঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন তাতে শ্রোতারা সুরের সম্মোহনে মোহিত হন।

যে সকল কবি এবং সুরকার কাব্য সঙ্গীত রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুল অন্যতম প্রধান 'নজরুলের কাব্য সঙ্গীত গুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এসব গানের সুর উৎকৃষ্ট কাব্যের দাস নয়। খেয়ালে যেমন নয় কথা সুরে অধীন, কথা ও সুরের সখ্য এখানেও ষোলঅনা পাই।' আবার "নজরুলের কাব্য সঙ্গীতে প্রেমের বিরহ ব্যথ্যা না পাওয়ার বেদনা অর্থাৎ বাংলা প্রেম কবিতার চিরন্তন রোমান্টিক বিষন্নতা আশ্চর্য্য সুন্দরভাবে রূপ লাভ করেছে। নজরুলের প্রেমের গানের মানবিক আবেদনের যে গভীরতা অন্যকারো রচনায় তা মে12ভার।" নজরুল কয়েকশত কাব্য সঙ্গীত রচনা করেছেন।

প্রথমে এই সঙ্গীত গুলোর শির দেশে মর্ডাণ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। পরে মর্ডান বাদ দিয়ে আধুনিক লেখা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলেন, 0His best songs are his best poems and, when considered in conjunction with the music, his strongest claim on posterity affects on0.

নিম্নে নজরুলের কতিপয় কাব্য সঙ্গীতের উল্লেখ করা গেল। যেমন ঃ-

১। আধুনিক- মালকোষ/ ত্রিতাল
'কোন মহাব্যোমে ধ্বনি ওঠে ওম্
আদি আকাশ বাণী'।

২। আধুনিক/দাদ্‌রা
'আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে,
যাক্‌না নিশি গানে গানে জাগরণে' ॥

৩। মিশ্র সুর/ দাদ্‌রা
'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে
করুণ অভিমান'।

৪। আধুনিক/কাহার্‌বা
'আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়,
আমার কথার ফুল গো আমার গানের মালা গো
কুড়িয়ে তুমি নিও' ॥

৫। আধুনিক/ কাহারবা
'আমায় নহে গো, ভালবাস শুধু, ভালবাস মোর গান।
বনের পাখীরে কে চিনে রাখে গান হ'লে অবসান' ॥

৬। আধুনিক/ কার্ফা
'ওই জল্‌কে চলে লো কার ঝিয়ারী ।
রূপ চাপেনা তার্ নীল-শাড়ী' ॥

৭। আধুনিক (সিন্ধু/দাদ্‌রা)

'বাসন্তী রং শাড়ী প'রো খয়ের্ রঙের টীপ্,
সাঁঝের বেলায় সাজ্‌বে যখন,জ্বলাবে যখন দীপ্' ॥

৮। আধুনিক কাহার্‌বা/

'ওগো প্রিয়, তব গান আকাশ গাঙের জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়।
মোর কথা গুলি কাঁদিছে বুকের দুয়ারে
পথ খুঁজে নাহি পায়' ॥

৯। আধুনিক/ দাদ্‌রা

'তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সেকি মোর অপরাধ ?
চাঁদের হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলেনাত' কিছু চাঁদ' ॥

১০। আধুনিক/ দাদ্‌রা

'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দেব খোপায় তারার ফুল,
কর্ণের দোলাব তৃতীয়া তিথি চৈতী চাঁদের দুল'।

১১। আধুনিক (ভৈরবী/ দাদ্‌রা),

'তুমি আর একটি দিন থাকো'।
হে চঞ্চল! যাবার আগে মোর মিনতি রাখো' ॥

১২। আধুনিক/ কাহার্‌বা

'তুমি কী দখিনা পবন ?
দুলে ওঠে দেহলতা ফুলে ফুলে ফুল্ল হ'য়ে ওঠে মন' ॥

১৩। আধুনিক/দাদ্‌রা

'ওগো প্রিয়া, তব অকরুণ ভালবাসা।
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ, কবিতায় দিল ভাষা' ॥

১৪। আধুনিক/কাহার্‌বা

'তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের' পরে।
মোর কণ্ঠ হ'তে সুরের গঙ্গা ঝরে' ॥

১৫। আধুনিক/কাহার্‌বা

‘আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখিছে যেন তোমারি চোখে’।

১৬। আধুনিক/দাদ্‌রা

‘কাছে তুমি থাক যখন তখন আমি দিই না ধরা।
দূরে থেকে কাঁদ যখন তখনি হই স্বয়ম্বরা’ ॥

১৭। আধুনিক/ কার্ফা

‘মালার ডোরে বেঁধো না গো বাহুর ডোরে বাঁধো।
কাঁদোই যদি, আমার বুকে মুখ লকিয়ে কাঁদো’ ॥

১৮। রাগ প্রধান/ দাদ্‌রা

‘আমি চিরতরে দূরে চ’লে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।
আমি, বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ, বেণী যাবে যবে খুলিতে’ ॥

১৯। আধুনিক/দাদ্‌রা

‘যা’রে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই কেন মনে রাখো তা’রে ?
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে’ ॥

২০। আধুনিক/দাদ্‌রা

‘মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা,
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে তুমি ওপারে ভাসালে ভেল’ ।॥

২১। আধুনিক (রাগপ্রধান/ একতাল)

‘শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে,
বাহিরে’ ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে’ ॥

২২। আধুনিক/দাদ্‌রা

‘তোমারি আঁখির মত আকাশের দুটি তা’রা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রা হারা
সে কি তুমি ? সে কি তুমি’ ?

২৩। আধুনিক/দাদ্‌রা

‘আমি চাঁদ নহি, অভিশাপ।
শূন্য হৃদয়ে আজো নিরাশার আকাশে করি বিলাপ’ ॥

২৪। আধুনিক(ভৈরবী মিশ্র/ কার্ফা)

‘বঁধু মিটিল না সাধ ভালবাসিয়া তোমায়।
তাই আবার বাসিতে ভালো আসিব ধরায়’ ॥

২৫। আধুনিক (মিশ্র যোগিয়া/ কাহার্‌বা)
'দুর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে আজ শরতের ভোর হাওয়ায়।
শিশির ভেজা শিউলি ফুলের গন্ধে কেন কান্না পায়' ?

২৬। আধুনিক
'দিনগুলি মোর পদ্মেরি দল যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে।
ওগো সুদুর, ওগো বিধুর। তোমার সাগর-তীর্থ পথে' ॥

২৭। আধুনিক/দাদ্‌রা
'(ওরে) শুভ্রবসনা রজনী গন্ধা, বনের বিধবা মেয়ে।
হারানো কাহারে খুঁজিস্‌ নিশীথ-আকাশের পানে চেয়ে' ॥

২৮। আধুনিক/দাদ্‌রা
'একাদশীর চাঁদ রে ঐ রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙ্গা কলস আকাশ-গাঙে ভাসে' ॥

২৯। আধুনিক/দাদ্‌রা
'জানি জানি প্রিয়   এ জীবনে মিটিবে না সাধ।
আমি জলের কুমুদিনী ঝরিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি' কাঁদিবে চাঁদ' ॥

৩০। আধুনিক/দাদ্‌রা
'আমি, সূর্য্যমুখী ফুলের মত দেখি তোমায় দুর থেকে।
দলগুলি মোর রেঙে ওঠে তোমার হাসির কিরণ মেখে' ॥

৩১। আধুনিক/দাদ্‌রা
'আমি হব মাটির বুকে ফুল।
প্রভাত বেলায় হয়'ত পা'ব তোমার চরণ-মূল' ॥

৩২। আধুনিক/দাদ্‌রা
'নয়ন ভরা জল গো তোমার আচঁল ভরা ফুল।
ফুল নেব না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল' ॥

৩৩। আধুনিক/কাহার্‌বা
'যত ফুল তত ভুল কন্টক জাগে।
মাটির পৃথিবী তাই এত ভালো লাগে' ॥

৩৪। আধুনিক/কাহার্‌বা
'ওগো প্রিয়, তব গান আকাশ গাঙে জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়
মোর কথা গুলি কাঁদিছে বুকের দুয়ারে
পথ খুঁজে নাহি পায়' ॥

৩৫। আধুনিক/দাদ্‌রা
'(তুমি) শুনিতে চেয়োনা আমার মনের কথা
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে,
কহে যাহা বন-লতা' ॥

৩৬। আধুনিক/ কাহার্‌বা
'তব গানের ভাষায় সুরে বুঝেছি।
এত দিনে পেয়েছি তা'রে
আমি যা'রে খুঁজেছি' ॥

৩৭। আধুনিক (মিশ্র জৌনপুরী দাদ্‌রা)
'আজি গানে গানে ঢাকব' আমার গভীর অভিমান।
কাঁটার ঘায়ে কুসুম ক'রে ফোটাব মোর প্রাণ' ॥

৩৮। আধুনিক /কাহারবা
'বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর।
সে আমারি গান, প্রিয়, সে আমারি সুর' ॥

৩৯। আধুনিক/দাদ্‌রা
'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুল গুলি' ॥

৪০। মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল ।
'যেন, বিন্দাবনের (ফিরদৌসের) এক মুঠো প্রেম আজও করে ঝলমল' ॥

৪১। নুরজাহান! নুরজাহান!
'সিন্ধুনদীতে ভেসে (এলে)মেঘলা-মতীর দেশে
ইরাণী গুলিস্তান' ॥

৪২। আধুনিক/দাদ্‌রা
'কথা কও, কও কথা, থাকিওনা চুপ ক'রে।
মৌন গগনে হের, কথার বৃষ্টি ঝরে' ॥

৪৩। আধুনিক/ কাহার্‌বা

'কবি সবার কথা কইলে এবার নিজের কথা কহ।
কেন নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ' ॥

বাংলা গানে নজরুল যে বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি এনেছেন তা সত্যিই বিস্ময়াবহ, শতাব্দি পেরিয়ে নূতন শতাব্দি চলছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি, আর ভবিষ্যৎ- এ পারবে বলে মনে হয় না।

বর্তমানে আমরা আধুনিক সঙ্গীতের দিকপাল হিসেবে অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায় ও হিমাংশু দত্তকে জানলেও তাঁরা কথা ও সুর উভয় ক্ষেত্রেই গভীরভাবে নজরুল দ্বারা প্রভাবান্বিত। কারণ কাব্য সঙ্গীতের বাণী ও সুরের যে ধারা নজরুল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেটাই আধুনিক সঙ্গীতের দিক নির্দেশনা বা পথ প্রদর্শক। তাই সঙ্গত কারণেই আধুনিক সঙ্গীতের প্রর্বতক বা জনকের বিজয় মুকুট নজরুলের মাথায় বিনা বাক্যে পড়িয়ে দিতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

♥ **রাঙ্গাজবা**
আবদুল আজিজ আল্-আমান, এম.এ

♥ **নজরুল স্বরলিপি**
১ম হইতে ১০ম খন্ড
হ র ফ প্রকাশনী

♥ **শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি অখÊ**
আবদুল আজিজ আল্-আমান, এম.এ

♥ **নজরুল ইসলাম**
মোস্তফা নুরউল ইসলাম

♥ **নজরুল-রচনাবলী দ্বিতীয় খÊ**
আবদুল কাদির।

সমাপ্ত